The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 1 No.2 Augus, 2008
Page : 115-124, Published on August 2009 © Registrar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

বাংলা ভাষায় মিশ্রীতির প্রয়োগ: সাম্প্রতিক প্রবণতা

সালমা নাসরীন
সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়

Abstract
As a social phenomenon, language is frequently influenced by different social codes, orders, and customs of society. Apart from the structural variety of language, many social dimensions of languages, develop over the time, occur. Nowadays Bengali- a rich language of south Asia- is encountering such social dimensional changes, as it interacts with its complex socio-cultural components. More elaborately, Bengali exhibits frequently different sociolinguistic characteristics such as code switching and code mixing, bilingualism and multilingualism, social dialect and dialectal free variation, language maintenance and language shift. This paper provides a brief description of sociolinguistic terms mentioned above from the point of view of the recent changes in Bengali.

***Key words**: speech community, sociolect, code switching code mixing, code shifting, language shift*

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাঞ্চলের যে কোনো ভাষাসম্প্রদায়ের (speech community) ভাববিনিময়ের জন্য একটি মানভাষা প্রচলিত থাকলেও ভাষাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ভাষার এই বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে আঞ্চলিক ব্যবধান, সামাজিক স্তরবিন্যাস, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, নৃগোষ্ঠী, লিঙ্গগত ইত্যাদি কারণে। এই কারণগুলো ভাষাকে নানাভাবেও প্রভাবিত করার ফলে একটি ভাষার ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। মানুষের বহুমুখী বাস্তবতা এবং স্বকীয় উপলব্ধি প্রকাশ করার জন্য ভাষিক ভিন্নতার প্রয়োজন হয় এবং প্রতিনিয়ত তার ব্যবহারও আমরা দেখতে পাই। প্রতিটি ভাষার যেমন অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তেমনি একটি ভাষার প্রতিটি রীতিরও এক ধরনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে। এই অন্তর্নিহিত শক্তি ও তাৎপর্যের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য আমরা একটি ভাষার বৈচিত্র্যময় রূপ প্রয়োগ করে থাকি। আসলে ভাষা মাত্রই নানা বৈচিত্র্যের অধিকারী। এমন কোনো ভাষা নেই যেটি সামাগ্রিকভাবে এক ও অখণ্ড।

যেসব কারণে এই বৈচিত্র্য ঘটে সেটিও বহু ও বিচিত্র। সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে তার গুরুত্ব আরও বেশি। তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞানী যেমন একজন ব্যক্তির মধ্যে আচরণ ও মনোগত বহু সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন, একইভাবে সমাজভাষাবিজ্ঞানীও একজন ব্যক্তির মধ্যে অনেক প্রকার সমাজসম্পর্ক খুঁজে পান। যেমন, একই ব্যক্তি কখনও কারো প্রভু, কখনও কারো উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সে কখনও অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজসেবক, ধর্মপ্রচারক, দলনেতা, আবার কখনও নিকট বা পরম আত্মীয়, বন্ধু, কিংবা শত্রু। সে কখনও জীবনসঙ্গী, কখনও স্বজন মাত্র। বহুস্তরবিশিষ্ট এই সমাজে যখন একজন ব্যক্তিকে চলাফেরা করতে হয়, তখন সে অনুযায়ী বহুরূপী ভাষাও তাকে নির্মাণ ও আয়ত্ত করে নিতে হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক স্ত রবিন্যাস অনুযায়ী অবিরাম প্রক্রিয়ায় চলতে থাকে ভাষা ব্যবহারের নানামাত্রা লক্ষণীয়। বাংলাভাষা তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাভাষায় বিভিন্ন ভাষিক ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য গড়ে ওঠার পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো :

১. সাধু ও চলতি রীতির মিশ্রণ
২. প্রমিত ও আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ
৩. বিদেশি ভাষার মিশ্রণ
৪. মিডিয়ার প্রভাবজনিত মিশ্রণ

১. সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ

পৃথিবীর অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষায় দুটি স্বতন্ত্র রীতি প্রচলিত আছে– সাধুরীতি ও চলিত রীতি। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) চলিতরীতিকে 'বঙ্গভাষা' এবং সাধুরীতিকে 'বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' বলে চিহ্নিত করেছেন (প্রমথ,১৯৮৫)। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এদের একটিকে সাধুভাষা, অপরটিকে অপর ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৮৫)। রীতিদুটির সঙ্গে বিস্তারিত পরিচয় না থাকলেও সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই এ দুয়ের ব্যবহারক্ষেত্র ও ক্রিয়াপদ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কমবেশি জ্ঞাত। বাংলা ব্যাকরণের পণ্ডিতগণ এই দুই রীতিকে স্বতন্ত্র রীতি হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং লিখিতরূপের ক্ষেত্রে এই দুই রীতির মিশ্রণকে দূষণীয় চিহ্নিত করে 'গুরুচণ্ডালীর অপরাধে পরীক্ষার খাতায় অমার্জনীয় নম্বরকর্তনযোগ্য' নিয়ম আরোপ করেন। অর্থাৎ দুটি ভাষার মর্যাদা আলাদা আলাদা। সাধারণ কথোপকথন বা সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে সাধুরীতি এখন ব্যবহৃত হয় না। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সাধু ও চালিতের যে ক্ষেত্রবিভাজন ছিল বর্তমানে তা ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্র। চলিত রীতি এখন ভাষার সবক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করছে। তবুও ক্ষেত্রবিশেষে সাধুরীতির ব্যবহার এখনও আমরা লক্ষ করে থাকি। সাধুরীতি একসময় লিখিত ক্ষেত্রে এবং ভদ্র ও শিক্ষিতজনের ভাষা হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার অধিকার অর্জন করেছিল এবং এই রীতির একটি সম্মানজনক ভাষা অবয়বও গড়ে উঠেছিল। সেজন্য এই রীতিকে

বলা হয় superposed variety । বর্তমানে সাধুরীতি ঐতিহাসিক স্মৃতি হলেও তা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়নি। সেজন্য প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায় আমাদের প্রায়ই শুনতে হয় নিম্নোক্ত ধরনের মিশ্রীতির ব্যবহার। যেমন :

ক. বলছিনা যাইতে দিমু না।
খ. সোজা হইয়া খাড়াও না হইলে পিটাব।
গ. বাহিরের ঘরে বসে থাকো।
ঘ. চুপচাপ বসিয়া থাকো (বসে থাকো অর্থে)

উদাহরণের নিম্নরেখ অংশগুলো সাধুরীতির। সাধারণ ভাষাব্যবহারকারী এরূপ মিশ্রণ করে থাকেন এবং ভাষাবিজ্ঞানীরা এর শুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি ভাষার অন্যতম প্রধান কাজ হলো জ্ঞাপন বা প্রকাশ করা। কিন্তু এখানে সেটি যেমন বাধা পাচ্ছে না, তেমনি শ্রোতার পক্ষে ভাবগ্রহণের অন্তরায়ও হচ্ছে না। বরং অনেক সময় শ্রোতা তা উপভোগ করেন। সাধারণত সাধু ও চলিতরীতির মিশ্রণের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বক্তার ভাষারীতির অজ্ঞতা, অসতর্ক মনোভাব, অল্পশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে ভাববিনিময়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ইত্যাদি।

২. প্রমিত এবং আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ

'যোজনান্ত ভাষা' কিংবা 'Language is graphically localised' অথবা এক্ষেত্রে গোপাল হালদারের উক্তি স্মরণীয়- 'ক্রোশে ক্রোশে ভাষা ভিন্ন হয়'(মনিরুজ্জামান, ১৯৮৫) এই ভিন্নতাই আঞ্চলিক ভাষা। সমাজভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়াম লেবভ (মৃণাল নাথ, ১৯৯৯ থেকে উদ্ধৃত) যাকে বলছেন ভাষাবৈচিত্র্যেরই স্বীকৃতি (A sub variety of a Language)

সাধারণ জনশ্রুতি আছে যে, প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর উপভাষা বদলায়। এখন অবশ্য এতটা পার্থক্য নেই– আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে আঞ্চলিক উপভাষার পার্থক্যগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তবুও উপভাষাগুলো লুপ্ত হয়নি। আর এই উপভাষাই বুঝিয়ে দিচ্ছে এক বাংলার মধ্যে অনেক বাংলা লুকিয়ে আছে, যেমন আছে এক ইংরেজির মধ্যে অনেক ইংরেজি। ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন 'ভাষা' র ধারণাটা একটা abstruct বা কল্পিত ধারণা, উপভাষা হলো জ্যান্ত, প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট ব্যবহৃত ভাষা। ম্যাক্সমুলার (পবিত্র, ২০০৩ থেকে উদ্ধৃত) এই কথাটাকেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন – " The real and natural life of Language is in its dialects" বলে (পবিত্র সরকার, ২০০৩)।

সাধারণভাবে উপভাষা বলতে বোঝানো হয় একটি দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাকে বা আঞ্চলিক ভাষাকে। তবে এখন উপভাষা শব্দটি আঞ্চলিক ভাষিক বৈচিত্র্যের প্রতিই নির্দেশ করে না, বরং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার ভাষার প্রতি নির্দেশ করে থাকে।

যেমন- উকিলের ভাষা, আমলার ভাষা, শিক্ষকের ভাষা, বিভিন্ন অপরাধীর ভাষা ইত্যাদি। ফার্গুসন(১৯৬০) উপভাষা সম্পর্কে বলেন 'উপভাষা হচ্ছে কোন ভাষার এক বা একাধিক বৈচিত্র্যের গুচ্ছ, যেগুলোতে বিদ্যমান থাকে একগুচ্ছ সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা তাদের স্বতন্ত্র করে দেয় ভাষার অন্যান্য বৈচিত্র্য থেকে এবং ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভাষিক বা অভাষিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এককরূপে। অর্থাৎ উপভাষা হচ্ছে কোন ব্যাপক ভাষাঞ্চলে ভাষাবৈচিত্রের আঞ্চলিক রূপ, যেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান থাকে নানা পার্থক্য, কিন্তু তা পরস্পর বোধগম্য। পরস্পর বোধগম্যতা হারালে তা পরিণত হয় ভিন্ন ভাষায় (হুমায়ুন, ১৯৮৫)। আবার জীবিকা, পেশা ও অন্যান্য নানাসূত্রের ভিত্তিতে যে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা লক্ষ করা যায় সেটিকে বলা হয় সামাজিক উপভাষা (sociolect)| অর্থাৎ সমাজোপভাষা হলো ভাষার বিশেষ বুলি যা কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণী ব্যবহার করে থাকে। কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর ভাষিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার হলো সমাজোপভাষা (মৃণাল, ১৯৯৯)। সমাজে আমরা যে শ্রেণীতে বাস করছি– অর্থনৈতিক সক্ষমতার মানদণ্ডে, (উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত) শিক্ষার হিসেবে (উচ্চশিক্ষিত, সাধারণ শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত) ইত্যাদি প্রত্যেকটি শ্রেণীর ভাষাও আলাদা আলাদা বাংলা হয়ে যাচ্ছে। যেমন- ইংরেজি মিডিয়ামের বাংলা, সংস্কৃতজীবীদের বাংলা, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাংলা, অল্পশিক্ষিতের বাংলা, শিক্ষার্থীদের কলেজীয় বাংলা, বস্তিবাসীদের বাংলা, আমলার বাংলা, বিভিন্ন অপরাধীর বাংলা, কৃষিজীবীর বাংলা, উকিলের বাংলা ইত্যাদি। ভাষার নিজস্ব শ্রেণীচরিত্র না থাকলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভাষাভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভাষার চরিত্রও আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, শ্রেণী সৃষ্টিতে ভাষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি একটি ভাষার শুধু বলার দক্ষতা অর্জন করে সে লেখার দক্ষতা অর্জনকারীর একস্তর নিচে। আবার যে ব্যক্তি কোনো ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে তার স্থান সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকের ওপরে। এভাবে শ্রেণী সৃষ্টিতে আমরা ভাষার ভূমিকা লক্ষ করি। অন্যদিকে শ্রেণী পরিবর্তন হলেই ভাষার পবির্তন হবে তা নয় এবং শ্রেণীচরিত্র সবসময় ভাষাচরিত্রের নির্ভুল নির্ণায়কও নয়।

যে কোন অঞ্চলের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের কৃষক, দিনমজুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভাষার একটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সাধারণত শিক্ষিত লোকের একটা আকর্ষণ থাকে ভাষার প্রমিত রূপের প্রতি। তারা সাধ্যমত চেষ্টা করেন ভাষার মান বা প্রমিত রূপটি আয়ত্ত করতে। কিন্তু তাদের অজান্তে ই আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণগত কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে যায় তাদের বাচনে যেখান থেকে তারা প্রায়ই বেরিয়ে আসতে পারেন না। এ ধরনের উচ্চরণগত বৈশিষ্ট্যকে ঔপভাষিক স্বাধীনবৈচিত্র্য (dialectal free variation) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানায় ও অন্যান্য কিছু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি পার্থক্য দেখা যায় 'e' এবং 'o' ধ্বনি দুটি উচ্চারণে। অধিকাংশ লোকই এমনকি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও

উচ্চমধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি 'e' কে নিম্নমধ্য সম্মুখ স্বরধ্বনি 'æ' রূপে উচ্চারণ করে থাকে। যেমন:elaka>ælaha, bela>bæla, lekha>læha, khela>khæla ইত্যাদি। একইভাবে উচ্চ মধ্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'o' কে , উচ্চসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'u' রূপে উচ্চারণ করার প্রবণতা অধিক পরিলক্ষিত। যেমন: gol >gul, cor>cur, roɟa>ruɟa, doba>duba ইত্যাদি। একই ভাষার ধ্বনির এই উচ্চারণগত ভিন্নতা আঞ্চলিক প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। এসব প্রভাব থেকে মুক্ত হতে প্রয়োজন সচেতনতা এবং চর্চার অনুকূল পরিবেশ, যা সবার পক্ষে লাভ করা সহজ হয়ে ওঠে না। কিন্তু তারপরেও অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষিত শ্রেণী আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবেশে বসবাস করে মান বা প্রমিত ভাষার প্রতি আন্তরিকতা বা আগ্রহের কারণে আঞ্চলিক টানে মানভাষার যে আরেকটি রূপ গঠন করেন কালে কালে ঐ রূপটিই ঐ অঞ্চলের জন্য একটি প্রমিত রূপ হিসেবে বিবেচ্য হয়ে ওঠে। যাকে বলা যেতে পারে urban standard বা নাগরিক মানভাষা। আমরা একে প্রমিত ভাষার বিশেষ রূপ বা 'প্রমিত আঞ্চলিক' বলতে পারি। বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এই চিত্রটিকে দেখানো যেতে পারে এভাবে:

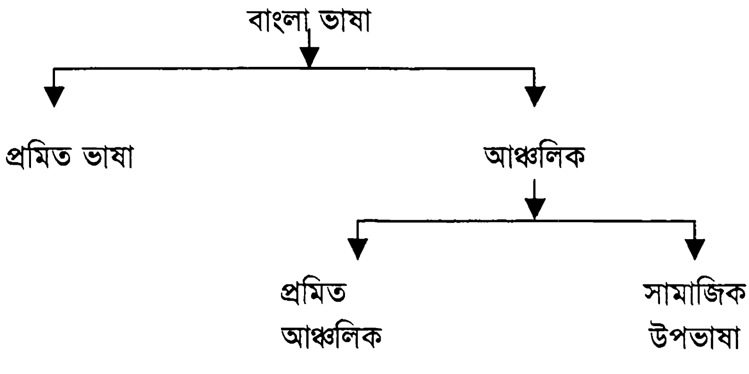

স্থানানুযায়ী একই ভাষায় এই যে বৈচিত্র্য তৈরি হয়, তা কখনো কখনো কোনো অঞ্চলের ভাষা মানচিত্রকে জটিল করে তুলে।

ভাষামিশ্রণ (code mixing) সৃষ্টিতে উপভাষার ব্যবহারকারীর ভূমিকা নেই বললেই চলে। কারণ উপভাষা ব্যবহারকারীগণ সবসময় একটা আটপৌরে ঢঙে, নির্বিঘ্ন, স্বতঃস্ফূর্ত ও জড়তাহীনভাবে ভাষা ব্যবহার করেন। সমস্যা দেখা দেয় প্রমিত এবং আঞ্চলিক মিশ্রিত ভাষাব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে। কারণ তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে, প্রশাসনে, শিক্ষিত মানুষের মননশীল আলোচনায়, অন্য শহর থেকে আগত

অতিথি বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে নিজস্ব শিক্ষিতভাব ও সুরুচিবোধের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করেন। বলাবাহুল্য অধিকাংশ সময় তা হয় ঔপভাষিক বৈচিত্র্যে। কিন্তু তিনি তার নিত্যদিনের ঘর-গৃহস্থালি হাট-বাজার প্রভৃতি প্রতিবেশে যে ভাষা ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তা হলো তার মূল আঞ্চলিক ভাষা। অথচ তিনি যে শিক্ষিত এই অহংবোধ কখানো সচেতন কখনো অসচেতনভাবে তাকে প্রমিত বাংলার শব্দভাণ্ডারের দিকে ঠেলে দেয়। এভাবে তার ব্যবহৃত ভাষা অধিকাংশ সময়ই হয়ে ওঠে প্রমিত ও আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ। মৃণাল নাথ সমাজভাষাবিজ্ঞানী লেবভকে (মৃণাল, ১৯৯৯:১৩২) সমর্থন করে বলেন – 'বোধহয় কোনো মিশ্র বা জটিল সমাজের পক্ষে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিকোণ হচ্ছে উপভাষাসমূহকে কোনো উপরিপন্ন (superposed/superordinate) মান্যভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা এবং উপভাষাসমূহকে সে ভাষার আওতায় তা স্বীকার করে নেওয়া'

আমরা জানি আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সবার পক্ষে কোনো ভাষার প্রমিতরূপটি আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। ঢাকা শহরে বাস করতে আসা মানুষ কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে আগে প্রমিত বাংলা শিখবেন, তারপর ব্যবসা বা চাকুরি খুঁজতে বের হবেন এমন হাস্যকর দাবি নিশ্চয় কেউ করবে না। একজন মানুষ ভাষার ভৌগোলিক সীমারেখাকে দূরে ঠেলে দিতে পারেন। কিন্তু তারপরেও থেকে যায় তার মানসিক সীমারেখার কথা। 'আপনার বাড়ি কি নোয়াখালি'? কিংবা 'আপনার কথায় বরিশাইল্ল্যা টান আছে'। ক্ষেত্র বিশেষে এমন বিব্রতকর উক্তি শুনে লজ্জিত হতে হয় অনেককে। অথচ বক্তা তার ভাবপ্রকাশে কতটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলো সেটি গভীরভাবে উপলব্ধি করলে কারো পক্ষে এমন উক্তি করা সম্ভব নয়। সত্যিকার অর্থে এমন মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় বক্তার ভাষা একদিকে লাভ করে গতিময়তা অন্যদিকে হয়ে উঠে বৈচিত্র্যময়তা। 'ভাষা ভৌগোলিক সীমা (geographically localised) গ্রহণ করুক আর নাই করুক, মানসিক সীমাও গ্রহণ করে এবং তার মাঝেই তার কেন্দ্রাভিগ এবং কেন্দ্রাতিগ কার্যকারণ সম্পর্ক গড়ে উঠে' (হুমায়ুন, ১৯৮৫)।

৩. বিদেশি ভাষার মিশ্রণ

দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক পরিস্থিতিতে ভাষীর ভাষাভাণ্ডারে একাধিক ভাষার সহাবস্থানের ফলে কোডের সরণ (code shifting) হতে পারে (মৃণাল, ১৯৯৯)। ভাষাবিজ্ঞানে কোডসরণ দুরকম হতে পারে। কোড মিশ্রণ (code mixing) এবং কোড পরিবর্তন (code switching)। কথা বলার সময় একভাষার সঙ্গে অপর ভাষার ব্যাকরণগত বিভিন্ন স্তরে যে সঙ্গতিপূর্ণ মিশ্রণ ঘটে, সেটি হচ্ছে কোডমিশ্রণ। কোড মিশ্রণ সাধারণত অসচেতনভাবে ঘটে থাকে। অন্যদিকে কোড পরিবর্তন সচেতনভাবে ঘটে থাকে। জন সোয়ানের মতে- 'Refers to instances when speakers switch between

codes (Languages, Language varities) in the course of a conversation. Switches may involve different amounts of speech and different Linguistic units- from several consecutive utterances to individual words and mophemes'...(Swan et al. 2004).
একজন ব্যক্তি যদি একের অধিক ভাষা জানেন এবং সেটি যদি পরিস্থিতি অনুসারে আলাদা আলাদা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখেন তখন সেটিকে বলা হয় কোড পরিবর্তন। অর্থাৎ কোড মিশ্রণ হলো একের অধিক ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে বাক্য তৈরি করা। আর কোড পরিবর্তন হলো বক্তার ভাষাটিকে পরিবর্তন করে ফেলা। যেমন- actually আমি একটি পূর্ণাঙ্গ থিয়েটারের কথা ভাবছি। I am sorry, আমার late হয়ে গেল। 'sunday evening এ চলে আসুন, আমরা movie দেখবো, and we will have dinner together, never mind, I don't like it if you miss' এ ধরনের কোড মিশ্রণ এবং কোড পরিবর্তন বিশেষ করে কথোপকথনভিত্তিক কোড পরিবর্তন (conversational code switching) প্রায় সবসময় করে থাকি। সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি স্বীকৃত বিষয়। পৃথিবীর অনেক ভাষায় বিশেষ করে পিজিন[১] (pidgin) ও ক্রেওল[২] (creole) ভাষার ক্ষেত্রে এই ভাষা মিশ্রণের গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্রিটিশ ভারতে প্রায় দুশ বছর বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে দ্বিভাষিক পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। প্রভুর ভাষা ইংরেজির আধিপত্যবাদের মধ্যে থেকেও বাংলাভাষা স্বমহিমায় স্বীয় শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, বহু ইংরেজি শব্দ আত্মীকরণের মাধ্যমে। একইভাবে বাঙালিও একটা দীর্ঘকালীন দ্বিভাষিক পরিস্থিতিতে বাস করে মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে অজান্তেই শিখে নিয়েছে ভাষাসরণের মতো একটি মূল্যবান প্রক্রিয়া। বলা বাহুল্য ভাষাসরণের পথ ধরেই শব্দ আত্তীকরণের কাজটি এগিয়ে যায়। বিদেশি শব্দ হঠাৎ করে বাংলা অভিধানে স্থান পাবে না। এর একটা দীর্ঘকালীন ব্যবহার থাকতে হবে ভাষাসরণ প্রক্রিয়ায়। ইংরেজিসহ আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ এভাবেই হয়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব সম্পদ। যদিও আজকাল পারিভাষিক সমস্যাকে সহজ করার জন্য প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলাভাষায় আত্মীকৃত হচ্ছে। যদি দেখা যায় ভাষাসরণের নামে ক্রমাগত মূলভাষার স্থানচ্যুতি ঘটছে তাহলে ভাষা প্রয়াণও (language death) ঘটতে পারে এবং উদ্ভব হতে পারে সম্পূর্ণ একটি নতুন ভাষার। সম্ভবত এমন আশঙ্কা থেকেই কোনো কারণে বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলতে শুনলে সন্দেহ প্রকাশ করেন সচেতন মানুষ। কারণ ভাষার প্রতি মানুষের অনুরাগ এতই গভীর যে, ভাষা ব্যবহারে সামান্য পরিবর্তন দেখা দিলে তা নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাই ভারতে হিন্দি এবং ইংরেজি মিশিয়ে যে হিংলিশ ভাষা তৈরি হচ্ছে- তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পবিত্র সরকার (২০০৩) পশ্চিমবঙ্গের

মিশ্ররীতির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন– ইংরেজি বাহনের ইশকুলে পড়া মেয়ে যখন বলে 'জানিস, কাল রাত্রে টিভিতে এমন একটা ফ্যান্টা মুভি ছিল আই হ্যাড্ টু সি ইট্ অল্ হাঁটুমুড়ে'- তখন তাদেরই বাড়ির কাজের মেয়ে হয়তো বলছে 'আদাদিদি আত্তিরবেলায় আমযাত্রা দেইখ্‌তে জাবে।' তারই পাড়ায় মাস্তান হয়তো বলছে, 'ও সব (এই দন্ত্য স ইংরেজি s - এর আওয়াজে) পোফেসর-টর বুঝি না, আপনি য্যাম লোক হন, ফের এ গলিতে ঢুকবেন তো বোমা পাল্টে দেব! (পবিত্র, ২০০৩ : ১১৫)।

যে কোনো ভাষায় পরিভাষা যেমন স্বীকৃত, তেমনি ঋণকৃত শব্দও (loan word) সমাজ স্বীকৃত। ঋণকৃত শব্দগুলো প্রকৃতপক্ষে আমাদের laxical gap পূরণের জন্য আহরিত বা ব্যবহৃত হয়। যেমন–টেলিফোন (telephone), কম্পিউটার (computer), টেলিভিশন (television) ইত্যাদি। কিন্তু ভাষা মিশ্রণের ক্ষেত্রে ভাষার স্বীকৃত শব্দ থাকতেও অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে বা কথা বলার সময় আমরা ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা ইরেজি শব্দ বা বাক্য বলে ফেলি অকারণে। এর কারণ ভাষাতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক দুই-ই হতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো :

ক. শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করা।
খ. শ্রোতার কাছে বক্তব্যকে শক্তিশালী করা।
ঘ. নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা ইত্যাদি।

এখানে আমরা ভাষাতাত্ত্বিক কারণটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। ভাষাতাত্ত্বিক কারণের মধ্যে ভাষার বাক্যগঠন বা শব্দনির্মাণ প্রক্রিয়া অন্যতম। এ কারণেই এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়। যেমন– বাংলা ভাষার বাক্য গঠনের একটা সাধারণ রীতি হলো– SOV
(বিশেষ্য+বিশেষ্য+ক্রিয়া)।

ক. সৃজন ভাত খায়।
খ. আপনাকে মাছ খেতে বলা হয়েছে/ বলেছে।
গ. আপনাকে ফোন /কল ব্যাক করতে বলেছে/বলা হয়েছে।

এখানে ফোন/ কল ব্যাক শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন– আমাকে একটা মিস্‌ড কল দিস। এর কোনো বাংলা পরিভাষা নেই। এটি আমাদের laxical gap। কিন্তু বাক্যে শব্দটি বিশেষ্য হিসেবে ঠাঁয় পেয়েছে। এছাড়া বাংলা ভাষার উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতির ব্যবহারও মিশ্রভাষার প্রভাবজাত। যেমন:

ক. তুমি সিটে গিয়ে বসো–ইরেজি (seat)+ এ
খ. তুমি বেসুরে গান গাইবে না– ফারসি 'বে' + সুরে

গ. বেটাইমে আসবে না–ফারসি 'বে'+ইংরেজি (time)+এ
ঘ. ওয়ারকারদের বেতন দিতে হবে– ইংরেজি (worker)+দের
এসব দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মিশ্রভাষায় কথা বলার সুযোগ ভাষা নিজেই আমাদের দিয়েছে, তার অভ্যন্তরীণ সংগঠনের নানা যোগসূত্রের মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমানে বাংলার সঙ্গে ইংরেজির যথেষ্ট মিশ্রণ ঘটছে। এর কারণ হচ্ছে ঘরের ভেতর বাংলা ইংরেজি মিশ্রণে কথাবার্তা চলে, ইংরেজিতে অনুষ্ঠান চলে, বিজ্ঞাপনে বিদেশি পণ্যের ব্যবহার, আছে ইন্টারনেট, ই-মেইল, স্বজন, সন্তান থাকে বিদেশে এবং দেশে সন্তানেরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছে। ফলে বদলে যাচ্ছে তাঁদের ভাষা এবং একটি নতুন মিশ্রবাংলা গড়ে উঠছে।

৪. মিডিয়ার প্রভাবজনিত মিশ্রণ
আজকাল টেলিভিশন নাটকে এবং উপস্থাপকদের প্রমিত, আঞ্চলিক এবং ইংরেজি ভাষায় মিশিয়ে কথা বলাটা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এতে বর্তমান বাংলাভাষার স্বাভাবিক গতিতে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। যেমন–'ডিয়ার ভিউয়ার্স এখন স্টারট হবে আপনাদের ফেভারিট মিউজিক প্রোগ্রাম, ভিউয়ার্স একটু অপেক্ষা করুন, বাকি প্রোগ্রাম দেখবেন ব্রেকের পর, নাটকের সংলাপগুলো এরকম – কি করছ, তোরে কইছি না এইটা না করতে, আমারে আগে বলছ না কেন্ ইত্যাদি। এছাড়া বাট, সো বিকজ, সাপোজ, ইয়েস, নো, গুড, ওকে ইত্যাদি তো বাংলাভাষার সঙ্গে মিশে গেছে। সবাই এখন বলতে ভুলে যাচ্ছে কিন্তু, কারণ, কাজেই, ধরুন, ইত্যাদি সুন্দর বাংলাগুলো। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভাষার এই নতুন রূপটি অনেকে মেনে নিচ্ছেন। এরফলে প্রান্তীয় উপভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে মান্য উপভাষা। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষাভাষীরা রাজধানীতে এসে বসবাস করার ফলে খুব সূক্ষ্মভাবে মৌখিক ভাষার একটা পরিবর্তন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সূচিত হয়েছে।

বহুজাতিক দেশ ও বহুজাতিক সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে অনেক ভাষারই আজ বেহাল অবস্থা। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অনেক ভাষাই আজ নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তামিল ও সিংহলীদের ভাষা প্রায় বিলুপ্তির পথে। তারা নিজের ভাষার চাইতে ইংরেজিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আবার ভারতেও নিজভাষার সঙ্গে ইংরেজির মিশ্রণে এক নতুন ভাষার জন্ম নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা ভাষার সংরক্ষণ (language maintenance), নাকি ভাষা সরণের (language shift) পক্ষে এটি আজ একটি বড় প্রশ্ন। বিশ্বায়নের ফলে ইংরেজিকে আমরা আজ গ্রহণ করার কথা বলছি ঠিকই, কিন্তু তা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে আমাদের নিজ ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমশ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমরা নিজের ভাষার ভেতর ইংরেজিকে যদি এভাবে স্থান করে দিতে থাকি, তাহলে ভবিষ্যতে সে আবার বাংলার শব্দভাণ্ডার ও পদবিন্যাসকে সরিয়ে দেবে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

উপসংহার
কোনো ভাষারই একটি অভিন্ন, বৈচিত্রহীন, অবিমিশ্র, সুসংহত রূপ থাকে না। বাংলা ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতাপশালী ভাষার মাহাত্ম্য, মিডিয়া, সংবাদপত্র

ইত্যাদির প্রভাব বাংলাকে মিশ্রিত করতে সাহায্য করছে। আসলে ভাষা মিশ্রণের বিষয়টি সর্বজনীন। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ কতটা দরকার? কেননা অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণের ফলে ভাষার বিস্তর বদল ঘটে এবং মৌলিকত্ব হারায় । তাই ইচ্ছামত ভাষার বদল না ঘটিয়ে বরং ভাষার প্রয়োজনীয় বদল ঘটিয়ে তার ভিতরের সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে হবে। যদি আমরা সেটি করতে সমর্থ হই, তাহলে ভাষা মিশ্রণ আমাদের জন্য খুব বেশি হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে না। সর্বোপরি পবিত্র সরকারের (২০০৩) মতে 'ভাষা ব্যবহারের নানা প্রান্তীয় ক্ষেত্রে (প্রবাসে, ঝগড়ায়, ইংরেজি জ্ঞানের বাহাদুরি দেখিয়ে বাংলার মধ্যে ইংরেজি কথার শব্দ নিক্ষেপ করে) ভাষার বিকৃতি বা মিশ্রণ একটু-আধটু দেখা দিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত ভাষার মূল ভূখণ্ড এবং তাদের জনগোষ্ঠী সংহত থাকে ততক্ষণ ভাষার মৌখিক রূপ নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার কিছু নেই। ভূখণ্ড আর জনগোষ্ঠীর বিচ্ছেদ ঘটলেই চিন্তা– যেমন হয়েছিল ইহুদিদের ক্ষেত্রে (পবিত্র, ২০০৩)'।

টীকা

১. ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যকোনো কারণে শহরে বন্দরে বিভিন্ন ভাষার মানুষেরা একত্র হলে যখন একে অপরের ভাষা জানে না, তখন সীমিত ক্ষেত্রে সংজ্ঞাপনের জন্য তারা নিজেদের ভাষা ছেড়ে দিয়ে মিশ্রিত ভাষায় কথা বলে, তখনই পিজিনের উদ্ভব হয়। এটি কারও মাতৃভাষা নয়, এটি মূলত দ্বিতীয় ভাষা। অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য ভাষা।

২. পিজিন যখন অপেক্ষাকৃত স্থিরতা লাভ করে মাতৃভাষা কিংবা প্রথম ভাষা হিসেবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে, তখন তাকে ক্রেয়ল বলে।

গ্রন্থপঞ্জি

হুমায়ুন আজাদ. ১৯৮৪. *বাঙলা ভাষা প্রথম খণ্ড.* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

মৃণাল নাথ. ১৯৯৯. *ভাষা ও সমাজ.* কলিকাতাঃ নয়া উদ্যোগ।

প্রমথ চৌধুরী. ১৯৮৫.বঙ্গভাষা বনাম সাধু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা. *বাঙলা ভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড* [সম্পা.] হুমায়ুন আজাদ. ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী. পৃ.৩৮৫-৩৮৬

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. ১৯৮৫. বাঙ্গালা ভাষা. *বাঙলা ভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড.* [সম্পা.] হুমায়ুন আজাদ. ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী. পৃ.৩৬৩-৩৭১

মনিরুজ্জামান. ১৯৮৫. ঢাকাই উপভাষা : আদিয়াবাদ প্রত্যঞ্চল. *বাঙলা ভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড.* [সম্পা.] হুমায়ুন আজাদ. ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী. পৃ.৩১৩-৩৩৫

সরকার, পবিত্র ২০০৩. *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ.* কলকাতাঃ দেজ পাবলিশিং।

Labov, W. 1966. *The Social Stratifecation of Language in New York City.* Wshington, D.C.: Center for Applied Linguistics.

Swan, J., Deumert, A., Lillis, A. & Mesthrie, R. 2004. *A Dictionary Of Sociolinguistics.* Edinburgh University Press.

Email Contact: salmanasrin_dul@yahoo.com